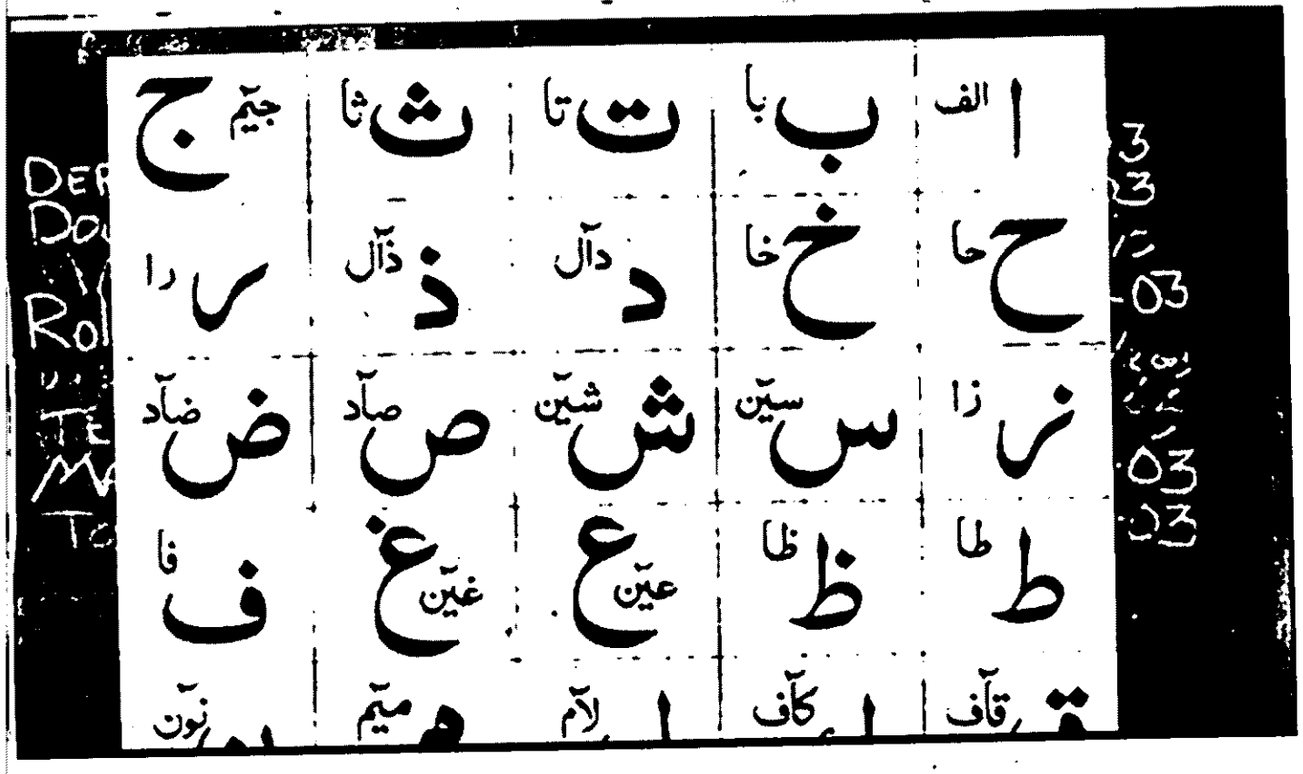

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা

● দেওয়ান শামসুর রহমান

আল কোরআনের প্রথম যে শব্দটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ওহি হিসেবে এসেছিল তা ছিল 'ইকরা' মানে পড় বা পাঠ কর। সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এ পাঁচ আয়াত হল— ১. পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে ৩. পাঠ করুন আপনার পালনকর্তা মহান দয়ালু ৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। এ অজানাকে জানতে, অদেখাকে দেখতে, সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা তৈরি করতে, অজ্ঞতাকে জয় করতে, অন্ধকার দূর করে পৃথিবীকে আলোয় আলোয় ভরিয়ে তুলতে সবার আগে যেটি প্রয়োজন সেটি হল শিক্ষা। আর শিক্ষার গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি আল কোরআনের উপরোক্ত সূরার আংশিক পাঠের মাধ্যমে। মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সম্মানের সঙ্গে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এ দেশের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ অত্যন্তপ্রখর। কিন্তু এ ধর্মীয় মূল্যবোধকে আমাদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষাকে এতটাই গৌণ করে রাখা হয়েছে যে, অন্য সাধারণ ১০টি বিষয়কে শিক্ষার্থীরা যতটা গুরুত্ব দেয় ধর্মশিক্ষাকে অতটুকু গুরুত্বও দিচ্ছে না। মুসলমানত্ব আমাদের পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত বলে আমরা মনে করি। ফলে এর জন্য আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করে একে পরিচর্যার মাধ্যমে আরও প্রস্ফুটিত করতে হবে— এ ধ্যান-ধারণা বা বোধশক্তি আমাদের অনেকের মধ্যেই কম। আমাদের দেশের স্তরভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্বিতীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা স্তর হল মাধ্যমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও মাধ্যমিক শিক্ষার একটা স্বকীয়তা রয়েছে। কারণ এ স্তরের শিক্ষার্থীরা অনেকটাই বুদ্ধদার বা বালক হওয়ার পথে থাকে। ফলে এখানে ধর্মীয় শিক্ষার ভিতটা অত্যন্ত মজবুত হওয়া জরুরি। আবার মাধ্যমিক স্তরের মাঝপথে অনেক শিক্ষার্থী হারিয়ে যায় শিক্ষার সুখ গ্রহণ থেকে। অনেক শিক্ষার্থী আবার এখান থেকে ঝরে পড়ে চলে যায় বিপথে। ফলে এখান থেকে যদি ধর্মশিক্ষাকে জোরালোভাবে শিক্ষার্থীর মন, মস্তিষ্কে প্রবেশ করানো যায় তবে ঝরে পড়া শিক্ষার্থী বিপথে যাবে না, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি কিংবা ইভটিজিংয়ের মতো অপকর্মে জড়িত হবে না। ফলে শান্ত থাকবে সমাজ ব্যবস্থা, শান্তিতে থাকবে দেশের জনগণ। এ পর্যায়ে আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষক কিংবা পাঠ্যবইগুলো আমাদের ধর্মীয় শিক্ষায় যথার্থতা লাভের ক্ষেত্রে কতটুকু ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করছে পারছে এ বিষয়টি আমাদের সাধারণ ধ্যানজ্ঞান দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি।

মাধ্যমিক স্তর : মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হল ষষ্ঠ-দশম শ্রেণী পর্যন্ত। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধান স্তরগুলোর মধ্যে অন্যতম এটি। ১০-১৫ বছরের কিশোর-কিশোরীরা এ স্তরের শিক্ষার্থী। কখনও কখনও এর অধিক বা কমও এ স্তরে পাওয়া যায়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা তখন বালক হওয়ার পথে চলে যায়। এ সময়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাটা হওয়া উচিত অত্যন্ত ব্যবহারিক। প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের জানানো উচিত। আমাদের দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে দুটো স্তর রয়েছে। এর মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক ষষ্ঠ থেকে অষ্টম এবং মাধ্যমিক নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত। সর্বোপরি ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্তরটিকে মাধ্যমিক স্তর বলা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষক না থাকলেও নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষক রয়েছেন। তবে তারা অধিকাংশই সম্ভবত নুরানি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। অর্থাৎ তাদের সরকারিভাবে এমন কোন প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা সম্ভবত নেই, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শুদ্ধভাবে কোরআন ও হাদিস শিক্ষা দেয়া যায়। পাঠ্যবইগুলোতে যতটা না ব্যবহারিক বিষয় আলোচিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি ফিকাহ শাস্ত্রবিষয়ক আলোচনা রয়েছে। পাঠ্যবইগুলো পড়ে হয়তো বা শিক্ষার্থীরা কিছু বিষয় জানছে। জানার জন্য তো যে কেউ যে কোন বই পড়েও জানতে পারে। তার জন্য পাঠ্যবইগুলো হওয়া উচিত জীবনসংশ্লিষ্ট। যেমন পাঠ্যবইয়ে সালাতের কথাও বলা আছে আবার জাকাতের কথাও বলা আছে। এখন প্রশ্ন হল— এ দুটি বিষয়কে যদি শিক্ষার্থীদের শুধু সাধারণ কিছু জ্ঞান দিয়ে জানানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয় তাহলেই কি পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্য সফল হবে? অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় ইবাদতের একটি আলোচনার বিষয় জাকাত। এখানে জাকাতের আলোচনার মধ্যে বলা হচ্ছে— 'সালাত ও জাকাত ইসলামের এমন দুটি রুকন যা অস্বীকার করলে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।' তাহলে বোঝা যাচ্ছে জাকাতের গুরুত্ব বোঝানোর জন্যও সালাতের গুরুত্ব উল্লেখ করতে হচ্ছে। একজন শিক্ষার্থী যদি জাকাত সম্পর্কে জানে সে বুঝতে পারে তার পক্ষে জাকাত নেয়া এবং দেয়ার বিধি কি, তাহলেই যথেষ্ট। কিন্তু সালাত সম্পর্কে সে যদি জানে সালাতের গুরুত্ব কি, এটিই শেষ কথা নয়। সালাতের খুঁটিনাটিসহ সবকিছু তাকে শিখতে হবে। শিখতে হবে, জানতে হবে এবং মানতে হবে। অর্থাৎ নিয়মিত নামাজ পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর পিতা-মাতার যতটুকু ভূমিকা রয়েছে বিদ্যালয়ের একজন ধর্মীয় শিক্ষকের সমান ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী উভয়ে পরীক্ষায় পাস কিংবা ভালো নম্বর পাওয়ার চেষ্টায় ব্রতী। শেখার কিংবা জানার আগ্রহ অনেক কম। এর আগে যে বিষয়টি বলা হয়েছে তা হল, একজন শিক্ষার্থী অন্য যে কোন বিষয়ের চেয়ে কম গুরুত্ব দেয় ধর্মশিক্ষাকে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এসএসসি পরীক্ষা মাধ্যমিক পর্যায়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা এবং একজন শিক্ষার্থীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষা। এসএসসি পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থী ভালো ফল করতে অর্থাৎ জিপিএ-৫ পেতে সবার আগে মনে করে সে ইসলাম শিক্ষায় জিপিএ-৫ পাবে। এটি খুবই সুখের কথা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, সবচেয়ে কম পড়বে এবং সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিয়ে ইসলাম শিক্ষাকে এবং সবার আগে 'এ প্লাস'-এর চিন্তা করবে ইসলাম শিক্ষায়। এ বৈপরীত্য শিক্ষাবিদরা খতিয়ে দেখছেন কিনা সন্দেহ। যেহেতু ইসলাম শিক্ষা বইয়ের প্রশ্নে কোন বাধ্যতামূলক আরবি লেখার প্রশ্ন থাকছে না, তাই আরবি লেখা-শেখার আগ্রহ কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে কাজ করছে না। ফলে তাকে বাড়তি পরিশ্রমও করতে হচ্ছে না। নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। এর মধ্যে কেবল একটি অধ্যায়ে পাঁচটি সূরা ও ১০টি হাদিসের বিবরণ রয়েছে। কোন একজন শিক্ষার্থী যদি মনে করে এ অধ্যায়কে স্পর্শ করবে না কিংবা কারও কাছে এটি কঠিন মনে হচ্ছে তাহলে এ অধ্যায় না পড়েও সে অনায়াসেই এ প্লাস পেতে পারে। ফলে সাধারণ একটু-আধটু আরবি পড়ার যে সুযোগ ছিল বইটিতে সেটিও না করে সে অনায়াসেই ভালো ফল করছে। সাধারণ শিক্ষায় অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোতে ব্যবহারিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত। ধর্মীয় শিক্ষায়ও যদি ২০-২৫ নম্বর ব্যবহারিক বিষয় থাকত, সেখানে শিক্ষার্থীকে নামাজ পড়া শিখতে হবে, জানতে হবে এবং পড়তে হবে; তবে এ নম্বর দেয়া হবে কিংবা সাধারণ দোয়া-দরুদ, মাসনুন দোয়াসহ প্রাত্যহিক কাজে ব্যবহৃত দোয়া এবং অন্যান্য সাধারণ নিয়ম-কানুন, যেমন— অজু, গোসল ইত্যাদি বাধ্যতামূলকভাবে শিখতে হবে। সাধারণ শিক্ষায় সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী একজন লোকও অনেক সময় ঈদের নামাজ ও জানাজার নামাজের পার্থক্য করতে পারে না। বাধ্যতামূলক বিষয়গুলো থাকলে একজন শিক্ষার্থী অবশ্যই জানাজার নামাজ শিখত, কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা থাকত। বিষয়টি ভালোভাবে জানতে যদি এর গুণগত মান বৃদ্ধি করা হতো তাহলে শিক্ষার্থী অধিক গুরুত্বসহকারে পড়ত। প্রয়োজনে ধর্মীয় শিক্ষকের শরণাপন্ন হতো। একজন শিক্ষার্থীকে কিংবা অভিভাবককে যদি গণিত বা ইংরেজি বিষয়ের জন্য বিদ্যালয়ের কোচিংয়ের মুখাপেক্ষী হতে হয় তবে ধর্মশিক্ষার জন্য এটা নয় কেন? এ বিষয়টিতে ভালো ফল করতে শিক্ষার্থী অধিক পরিশ্রম করবে, বেশি বেশি পড়াশোনার ফলে বেশি করে জানতে পারবে। বিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষকদের গুরুত্ব বাড়বে। তাই বিষয়টির গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য এর সিলেবাসে ব্যাপক পরিবর্তন আনা জরুরি। ব্যক্তি, সংসার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্মশিক্ষা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে; যদি শিক্ষাবিদরা, বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে অনুভব করেন।

সমকাল
তারিখ 2 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...